রক খাবার.... ৩
উদ্বুদ্ধকরণ.... ৫
কেঁচোকৃমি.... ৬
উচ্চ রক্তচাপ.... ৮

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

ICDDR,B
CENTRE
FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৩ সংখ্যা ৪ মাঘ ১৪০১

জরুরী পরিস্থিতিতে প্রসূতির সেবা

পারভীন এ খানম
ডা: মহসীন উদ্দিন আহমেদ

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার বেশি। ইউনিসেফ-এর তথ্যানুসারে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২৮০০০ মা গর্ভধারণ ও প্রসবজটিলতার কারণে অকালে মারা যায়। মাতৃমৃত্যুর এই হার শতকরা ৫.৭ অর্থাৎ প্রতি ১০০০ জীবিত শিশুর জন্মকালে প্রায় ৬ জন মা মৃত্যুবরণ করছে যা উন্নত বিশ্বের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। এর অন্যতম প্রধান কারণ গর্ভ ও প্রসব-সংক্রান্ত জটিলতা। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, রক্তক্ষরণ, গর্ভপাত এবং জটিল প্রসবের কারণে এসব মৃত্যু ঘটে। প্রায় ২৬ শতাংশ মা মারা যায় প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণে, ২১ শতাংশ গর্ভপাতজনিত কারণে, ১৬ শতাংশ একলামশিয়ায়, ১১ শতাংশ প্রসবোত্তর সংক্রমণে, ৮ শতাংশ বাধাগ্রস্ত প্রসব এবং বাকী ১৮ শতাংশ মৃত্যুবরণ করে অন্যান্য কারণে। গর্ভবতী মায়েদের এসব জটিলতায় আক্রান্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ একজন গর্ভবতী মায়ের মৃত্যুর সম্ভাবনা অন্য একজন মহিলার তুলনায় অনেক বেশি।

এ-বিষয়ে বর্তমানে কিছুটা সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৮৭ সালে নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত মায়ের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'নিরাপদ মাতৃত্ব' কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং ২০০০ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের দেশে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাতৃমৃত্যুর হার ৪.৫ ভাগে নামিয়ে আনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

'নিরাপদ মাতৃত্ব' বলতে আমরা বুঝি মহিলাদের জন্য এমন একটি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যেখানে একজন মা কখন গর্ভবতী হবেন, ক'টি সন্তান নেবেন এ-বিষয়ে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন এবং গর্ভবতী হলে তার জন্য নিম্নলিখিত সেবাসমূহ নিশ্চিত করবেন :

— গর্ভজনিত জটিলতায় প্রতিরোধমূলক ও চিকিৎসামূলক সেবা

— প্রসবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সহায়তা প্রদানের সুযোগ

— জটিল ও বাধাগ্রস্থ প্রসবে উপযুক্ত সেবা গ্রহণের সুব্যবস্থা

— প্রসব-পরবর্তী পরিচর্যা।

আগেই বলা হয়েছে নিরাপদ মাতৃত্ব সম্পর্কে ইতোমধ্যেই কিছুটা সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্তমানে গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রশ্ন হলো: গর্ভকালীন পরিচর্যার উদ্দেশ্য কী? একজন মাকে গর্ভকালীন সময়ে যে পরিচর্যা প্রদান করা হয় তার উদ্দেশ্য হলো: প্রথমতঃ ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভ নির্ণয় করা এবং সময়মত উপযুক্ত সেবা প্রদান করা; গর্ভবতী মাকে এসময় খাদ্য, বিশ্রাম, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এসব বিষয়ে উপদেশ দেয়া। দ্বিতীয়তঃ ধনুষ্টংকারের টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ

গর্ভকালীন সময় যদি পা ফুলে যায়;
যদি খুব বেশি মাথাব্যথা হয়;
যদি খিচুনি দেখা দেয়

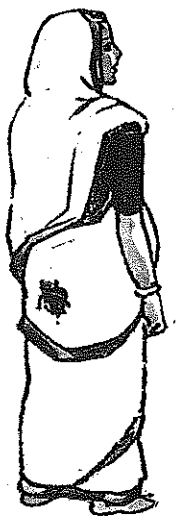

যদি গর্ভকালীন সময় রক্ত যায়;
গর্ভত্তোর সময় যদি বেশি রক্ত যায়

করা। তাছাড়া এসময় ফলিক এসিড ও আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ানো হয় যা রক্তস্বল্পতা থেকে গর্ভবতী মাকে রক্ষা করে।

গর্ভকালীন সময়ে এধরনের যত্ন প্রদানের ব্যবস্থা ছাড়াও বাড়িতে নিরাপদ প্রসবে সহায়তা করার জন্য সরকার প্রতি গ্রাম থেকে একজন দাইকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রসব করানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। নিরাপদ প্রসব বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইরা জটিলতায় আক্রান্ত মাকে সময়মত যথোপযুক্ত চিকিৎসা প্রদানে সহায়তা করে থাকেন। আমাদের দেশে বেশিরভাগ গর্ভখালাস করা হয় প্রতিবেশী, আত্মীয় বা অদক্ষ দাইদের সাহায্যে যাদের অনেকেরই প্রসবকালীন জটিলতা সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই, ফলে উপযুক্ত চিকিৎসা সঠিক সময়ে প্রদানে বিলম্ব হয় এবং একারণে অনেক প্রসূতির মৃত্যু ঘটে। উল্লিখিত ব্যবস্থাসমূহ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ, কিন্তু এখন পর্যন্ত গ্রামীণ মায়েরা এই সেবা গ্রহণের ব্যাপারে তেমন সচেতন নন। BIRPERHT-এর এক জরিপে দেখা গেছে, ২৮ ভাগ গর্ভবতী মা সেবা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে গেছেন এবং প্রায় ৫০ ভাগ মাকে বাড়িতে স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

গর্ভকালীন পরিচর্যার বিভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে বা প্রসবোত্তর সময়ে কোনো জরুরী সমস্যা দেখা দিলে প্রসূতির সঠিক পরিচর্যার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে জরুরী পরিস্থিতিতে প্রসূতিকে উন্নত সেবা প্রদানের জন্য কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন, ফলে মা ও শিশুমৃত্যুর হার অনেকটা কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

অনেকের এমন ধারণা থাকতে পারে যে নিয়মিত গর্ভকালীন যত্ন নিলে বিপদজনক অবস্থা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তা সঠিক নয় যেমন: গর্ভকালীন যেকোনো সময়ে যোনিপথে রক্তপাত হতে পারে যা আগে থেকে আশংকা বা অনুমান করা যায় না। তেমনিভাবে প্রসবে এমনসব জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যার জন্য হাসপাতালে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে জরুরী চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। BRAC-পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভকালীন পরীক্ষার মাধ্যমে যেসব মাকে ঝুঁকিপূর্ণ নয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল তাদের অনেককেই জটিল অবস্থা মোকাবেলা করতে হয়েছে অর্থাৎ জটিলতা বা সমস্যা গর্ভধারণ বা প্রসবের যেকোনো সময় দেখা দিতে পারে এবং প্রয়োজনীয় সেবা সময়মত না পেলে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। প্রতিবছর আমাদের দেশে প্রায় ৬ লক্ষ মা গর্ভ-সংক্রান্ত জটিলতায় আক্রান্ত হন যাদের বিশেষ সেবা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তাই প্রতিটি মা এবং অভিভাবককে গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসবোত্তর বিপদজনক অবস্থা সম্পর্কে জানাতে হবে যাতে তারা নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব না করেন। তাছাড়া জটিল অবস্থার সৃষ্টি হলে কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে এসব বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে পরিকল্পনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠ-পর্যায়ের কর্মীদেরকে বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে এবং এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ সম্পর্কে জনগণকে জানাতে হবে এবং তার সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সাধারণত: যে-তিনটি কারণে জটিলতায় আক্রান্ত মায়ের জরুরী সেবা গ্রহণ বিলম্বিত হয়ে থাকে সেগুলো হলো :

(ক) সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব
(খ) যাতায়াত সমস্যা
(গ) চিকিৎসা কেন্দ্রে সেবা প্রদানে বিলম্ব এবং অপর্যাপ্ত সেবা।

(ক) আমাদের দেশের বেশিরভাগ মা সাধারণত: সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দরুণ গর্ভ-সংক্রান্ত জটিলতায় জরুরী সেবা গ্রহণে বিলম্ব করে থাকেন। বিশেষ করে জটিলতার লক্ষণসমূহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে তা হয়ে থাকে।

গর্ভকালী সময়ে যদি জ্বর তিন দিনের বেশি থাকে;
গর্ভোত্তর সময় যদি বেশি জ্বর হয়

আমাদের দেশে গ্রাম-পর্যায়ে মায়েদের, বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের গর্ভ-সংক্রান্ত জটিলতা সম্পর্কে এমন জ্ঞান থাকতে হবে যেন অসুবিধা দেখা দেয়ার সাথে-সাথে হাসপাতালে জরুরী সেবা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ

(৪ এর পাতায় ...)

শিশুর সম্পূরক খাবার

ডা. এম. আমিনুল ইসলাম
ডা. নাসিমা জে. আমিন

শিশুর পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধই তার উৎকৃষ্ট এবং একমাত্র খাবার। যদিও দুই বছর বয়স পর্যন্ত অথবা সম্ভব হলে আরও বেশিদিন শিশুকে বুকের দুধ দেয়া উচিত, পাঁচ মাস বয়স থেকেই বুকের দুধের পাশাপাশি তাকে অন্যান্য বাড়তি খাবার দিতে হবে। একজন শিশু যে-ওজন নিয়ে জন্মায়, তা পাঁচ মাস বয়সে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয় এবং শিশুর বয়স যখন এক বছর, তখন এই ওজন বেড়ে দাঁড়ায় জন্মকালীন ওজনের প্রায় তিনগুণ। পক্ষান্তরে মায়ের বুকের দুধ সময়ের সাথে-সাথে কমতে থাকে। শুধুমাত্র বুকের দুধ বাড়ন্ত শিশুর চাহিদা মেটাতে পারে না। আবার হঠাৎ করে শিশুকে শক্ত খাবারও দেয়া যায় না। এজন্যে দরকার হয় অভ্যাস গঠনের এবং তা করতে হবে শিশুর পাঁচ মাস বয়স থেকেই। শিশুকে দুধের অভ্যাস ছাড়িয়ে ধীরে-ধীরে অন্য খাবার খাওয়ার অভ্যাস গঠনের প্রক্রিয়াকে বলে উইনিং (weaning)। এই সময়টা শিশুর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক মা, বিশেষত: কর্মজীবী দরিদ্র মা তার ছোট সন্তানটিকে সময় ক'রে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন না, অতৃপ্ত শিশু কান্নাকাটি করতে থাকে। মা মনে করেন বুকের দুধ কমে গেছে। গরুর দুধ কেনার সামর্থ্য নেই বলে দুধের বিকল্প হিসেবে পাঁচ মাসের অনেক আগে থেকেই চালের গুঁড়ো জাল দিয়ে খাওয়াতে শুরু করেন। শিশু বঞ্চিত হয় পরিমিত পুষ্টি থেকে। আবার অনেক মা ধারণা করেন, তার শিশু এত তাড়াতাড়ি অন্য খাবার সহ্য করতে পারবে না। কারো কারো ধারণাই থাকে না যে বয়স বাড়ার সংগে-সংগে শুধুমাত্র বুকের দুধ শিশুর জন্য যথেষ্ট নয়। শিশু বড় হতে থাকে কিন্তু অন্য খাবার খেতে শিখে না। তাকে হঠাৎ করেই অন্যদের জন্য তৈরী খাবার দেয়া হয়। সে খেতে না পেরে মুখ থেকে বের করে দিতে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই বয়সের তুলনায় শিশুর বর্ধন বিঘ্নিত হয় বলে ক্রমান্বয়ে শিশু অপুষ্টিতে ভুগতে থাকে। কাজেই কোন বয়স থেকে ছোট শিশুকে বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার দিতে হবে তা জানার সংগে-সংগে মায়েদের ধারণা থাকতে হবে কোন বয়সে কিধরনের খাবার দিতে হবে এবং কতটুকু দিতে হবে।

বাড়তি/সম্পূরক খাবার নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে খাবারগুলো সহজলভ্য কিনা এবং পরিবারের আয়ের সংগে সংগতিপূর্ণ কিনা। সেজন্যই শিশুকে বাড়তি কী খাবার দিতে হবে তা জানার আগে জানতে হবে বছরের কোন সময়ে কী খাবার পাওয়া যায়, সেগুলোর দাম কত, মায়েরা এই খাবারগুলো কিভাবে রান্না করে থাকেন এবং তাদের কোনো বিশেষ খাদ্য সম্পর্কে ভীতি বা কুসংস্কার আছে কিনা। মাকে যদি এমন খাবারের কথা বলা হয় যেগুলো তার সাধ্যের বাইরে তাহলে মায়ের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার শিশুকে তা খাওয়াতে পারবেন না। আবার মায়ের বিশ্বাসকে গুরুত্ব না দিয়ে যে-খাবারের প্রতি তার ভীতি রয়েছে তাই যদি খাওয়াতে বলা হয় তবে তা মা মানতে চাইবেন না। বাড়তি খাবার হিসেবে কোনো বিশেষ খাবারই খাওয়াতে হবে এমন কোনো কথা নেই। হরেক রকম উপকরণ থেকে একটা বেছে নিলেই হলো। তবে অনেক ক্ষেত্রেই মা বা দাদী-নানীর সংগে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদের বুঝিয়ে কুসংস্কার দূর করা যায়।

বয়সের তারতম্য অনুসারে বাড়তি খাবারের উপাদান ও এর পরিমাণ ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। পাঁচ মাস বয়সের একজন শিশু যখন প্রথম বাড়তি খাবারের অভ্যাস করবে, তার জন্য উপযুক্ত খাদ্য হবে চাল ও গুড় দিয়ে তৈরী সুজি বা সিদ্ধ আলু ও কিছু তেল দিয়ে রান্না-করা নরম জাউ। কোনো কোনো শিশু লবণ দিয়ে রান্না খাবার পছন্দ করে, কেউবা একটু মিষ্টি খাওয়া পছন্দ করে। তবে মিষ্টি দিলে মনে রাখতে হবে খুব বেশি মিষ্টি যেন না হয়—তাহলে শিশু বুকের দুধ খেতে চাইবে না। এছাড়াও মৌসুমী ফল যেমন : পাকা কলা, পেঁপে বা আম দেয়া যেতে পারে। অনেক মা বাচ্চাকে শুধুমাত্র সাগু বা বার্লি দিয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে সাগু বা বার্লিতে শুধুমাত্র শর্করা থাকে এবং বাড়তি খাবার হিসেবে তা সম্পূরক নয়। অনেকে আবার বাজার থেকে টিনজাত খাবার (যেমন সেরিলাক, মাইবয়) কিনে নিয়ে যান শিশুর জন্য। খাদ্যমানের দিক থেকে এগুলো বাড়িতে-তৈরী বাড়তি খাবারের মত হলেও এগুলোর দাম অনেক বেশি। অধিকন্তু ঘরে-তৈরী খাবার টাটকা থাকে এবং নিজের পছন্দমত হয়। সেজন্য ঘরে-তৈরী খাবারই শিশুর জন্য ভাল।

শিশুর বয়স যখন ছয় থেকে নয় মাসে এসে দাঁড়ায় তখন তাকে জাউ-এর সংগে অন্যান্য সব্জি যেমন : আলু, পেঁপে, কাঁচাকলা, গাজর ইত্যাদি খোসা ছাড়িয়ে সিদ্ধ করে খাওয়ানো যেতে পারে। এমনকি পরিবারের জন্য রান্না-করা সব্জিও ভাল করে চটকে বাচ্চাকে দেয়া যায়। এসব খাবার অবশ্যই তেল দিয়ে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। অনেক মা তরকারি সিদ্ধ করার সময় ওপর থেকে পানি নিয়ে শিশুকে দিয়ে থাকেন অথবা পাতলা-করে স্যুপ রান্না করে খাওয়ান। এসব খাবারের গুণগত মান খুব কম থাকে বলে এগুলো সম্পূরক খাবার হিসেবে ভাল নয়। তবে এগুলোর সংগে তরকারি চটকে, কিছুটা তেল মিশিয়ে ঘন-করে শিশুকে খাওয়ানো যায়। এই বয়সে শিশুরা বসতে শিখে এবং তাদের দাঁত-উঠা শুরু হয়; সেজন্য তাকে নিজে-নিজে খেতে উৎসাহ দিতে হবে। এসময় হাতে বিস্কুট বা গাজরের টুকরা দিলে তারা এগুলো দাঁত দিয়ে কুড়ে-কুড়ে খেতে ভালবাসে।

বয়স যখন এক বছর ছুঁই-ছুঁই করে, তখন শিশুকে ঘরে-তৈরী বিভিন্ন রকমের খাবার দিনে চার-পাঁচবার খাওয়াতে হবে। চাল, ডাল, মৌসুমী শাক-সব্জি এবং তেল দিয়ে নরম-করে খিচুড়ি রান্না করে শিশুকে খাওয়াতে হবে। সামর্থ্য থাকলে মাছ এবং ডিমও দেয়া যেতে পারে। তবে এই বয়সে শুধুমাত্র ডিমের কুসুম দিতে হয়। এক বছরের পর থেকে ডিমের সাদা অংশও দেয়া যায়।

এক বছরের পর থেকে শিশু পরিবারের অন্যদের জন্য রান্না-করা খাবার খেতে পারে। তবে এসব খাবার হতে হবে নরম এবং ঝাল ছাড়া। মনে রাখতে হবে এসময় বুকের দুধ খুবই কমে যায় এবং শিশুর খাদ্য চাহিদার অধিকাংশই মিটাতে হয় অন্যান্য খাবার দিয়ে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, শিশু এখান থেকে কিছু ওখান থেকে কিছু নিয়ে খাচ্ছে। কিন্তু সবমিলে পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছে না। মাকে খেয়াল রাখতে হবে, শিশুকে প্রতিবার দুই থেকে তিন আউন্স করে দিনে অন্তত: পাঁচবার খাবার দিতে হবে। এছাড়াও অনেক শিশুকে মা এবং অন্যান্য আপনজনেরা নিজের সাথে নিয়ে খেতে

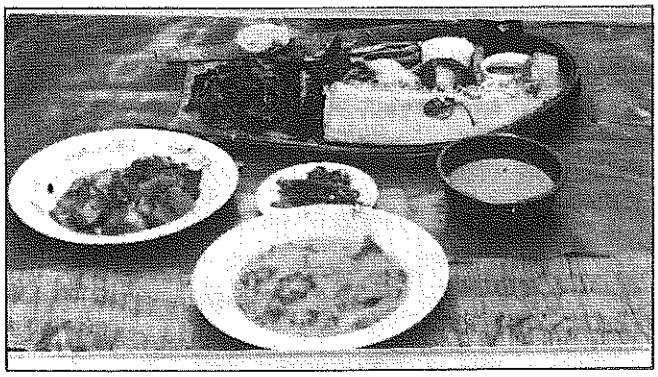

শিশুর সম্পূরক খাবার হওয়া চাই সুষম

বসেন—এতে সে কতটুকু খেল তা আন্দাজ করা কঠিন হয়। সেজন্য শিশুর খাবারের পাত্র আলাদা থাকা ভাল, যাতে মা খাবারের পরিমাণ থেকে অনুমান করতে পারেন সে কম খেলো না বেশি খেলো।

শিশুর বিভিন্ন বাড়তি খাবার কী হওয়া উচিত এবং তা কিভাবে রান্না করতে হবে তা এতক্ষণ আলোচিত হলো। এ-প্রসংগে আরো কতগুলো বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এক বছর বয়সের আগে মা তার শিশুকে সাধারণত: বুকের দুধ বা পানি দিয়ে পাতলা করে গরুর দুধ দিয়ে থাকেন। সেইসংগে বাড়তি খাবার দিলেও তার পরিমাণ হয় খুবই অল্প। সেজন্য মাকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে শিশুকে পাঁচ মাস বয়স থেকেই বুকের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবারে অভ্যস্ত করে তোলেন। বয়স অনুসারে শিশুকে কতটুকু বাড়তি খাবার দিতে হবে এবং কতবার খাওয়াতে হবে তা মাকে জানানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই খাবার কী দিয়ে খাওয়ানো উচিত সেটিও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যদিও চামচ দিয়ে খাওয়ানো সুবিধাজনক এবং স্বাস্থ্যসম্মত, আমাদের অভ্যাসের সংগে সংগতি রেখে হাত দিয়ে খাওয়ানোই উৎসাহিত করা উচিত। তবে হাত সাবান বা ছাই দিয়ে খুব ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে। তেমনি রান্না করার পাত্র এবং খাবারের পাত্রও পরিস্কার করে ধুয়ে নিতে হবে। অনেক মা প্রশ্ন করে থাকেন কোনটা আগে খাওয়াবেন—বুকের দুধ না অন্যান্য খাবার। যেহেতু এক বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধই প্রধান খাবার, শিশুকে প্রথম বুকের দুধ দিয়ে তারপর বাড়তি খাবার দেয়া উচিত। ক্ষুধার্ত শিশু জোরে-জোরে টেনে দুধ খেতে চায়—এতে বুকে দুধ বেশি আসে এবং মায়ের বুকে অনেক দিন ধরে পর্যাপ্ত দুধ হয়। তবে এক বছরের পর শিশুকে বাড়তি খাবার আগে দিয়ে তারপর বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। শিশুর খাবার দীর্ঘ সময় ফেলে রাখা উচিত নয়। এতে করে খাবারে নানা রকম জীবাণু জন্মে এবং শিশুর অসুখ হতে পারে। আবার শিশুর জন্য দিনে কয়েকবার রান্না করাও সবসময় সম্ভব হয় না। তাই তৈরী খাবারের ফাঁকে-ফাঁকে পাকা মৌসুমী ফল, রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই শিশুকে দেয়া যায়। শিশু যত রকমারি খাবার খাবে তত তার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

অনেক সময় মায়েদের, বিশেষত: উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মায়েদের অভিযোগ করতে দেখা যায়, তাদের শিশুরা বাড়তি খাবার খেতে চায় না। অনেকে সেজন্য জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। এতে করে, খাওয়া সম্পর্কে শিশুমনে একটা ভীতির সঞ্চার হয়। এমনটি করা উচিত নয়। খাওয়ার স্মৃতি হওয়া উচিত সুখময়, জোর জবরদস্তি করে খাওয়ানো উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, খাওয়ানোর ব্যাপারে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। বড়দের মত শিশুরাও কোনো একটা বিশেষ ধরনের খাবার অন্যটার চেয়ে বেশি পছন্দ করতে পারে। তেমনি তারা কোনোদিন অন্যদিনের চাইতে বেশি ক্ষুধার্ত থাকতে পারে। সেজন্যই খাওয়ার ব্যাপারে শিশুর আগ্রহকে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

পরিশেষে বলবো, সুস্থ-সুন্দর শিশুই দেশের ভবিষ্যত। এজন্য শিশুর অনভিপ্রেত পুষ্টিহীনতা এড়াতে এবং তাকে রোগমুক্ত রাখতে মায়েদের সম্যক ধারণা থাকতে হবে শিশুকে কোন বয়সে কিধরনের বাড়তি খাবার দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের সহজলভ্য খাদ্যদ্রব্য দিয়েই তৈরী করা যায় শিশুর সম্পূরক খাবার। দরকার শুধু পরিমিত জ্ঞানের এবং সদিচ্ছার।

প্রসূতির সেবা

(১ম পাতার পর)

গ্রহণ করেন। ইউনিসেফ-এর মতে নিম্নবর্ণিত অবস্থা দেখা দিলে তা করতে হবে :

— প্রসবের পূর্বে যেকোনো সময় যদি যোনিপথে রক্তক্ষরণ হয়

— গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর যদি অতিরিক্ত রক্তপাত হয়

— যদি প্রচণ্ড মাথাব্যথা, পা ফুলে-যাওয়া অথবা খিচুনি দেখা দেয়

— যদি বেশিদিন জ্বর থাকে

— যদি দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব বা মাসিক হয়

— প্রসবের সময় শিশুর মাথা ছাড়া যদি অন্য কোনো অঙ্গ বের হয়ে আসে।

— গর্ভকালীন সময়ে যদি পানি ভাঙে।

(খ) রাস্তাঘাট, যানবাহন তথা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হবার কারণে একদিকে যেমন বিলম্বের মাত্রা বেড়ে যায় তেমনি জটিলতার মাত্রাও চরমে পৌছে। তাই জটিলতার লক্ষণসমূহ সম্পর্কে আগে থেকে জানা থাকলে মা নিজে বা তার অভিভাবকগণ নিজেরাই নিজেদের ব্যাপারে সময়মত উন্নত সেবা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

(গ) সাধারণত: যে তিন ধরনের বিলম্বের কারণে একজন প্রসূতির মৃত্যু হতে পারে তার একটি হলো স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা প্রদানে সুব্যবস্থার অভাব, কেননা উল্লিখিত সমস্যার মোকাবেলা ক'রে একজন মা যখন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে পৌছান তখন হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতির স্বল্পতার জন্য, এমনকি কর্তব্যরত চিকিৎসকের গাফিলতির জন্যও একজন প্রসূতি উপযুক্ত সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। তাই এসব কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দকেও এ-ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে এবং সেজন্য

একটি সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থার আওতায় প্রসূতির জন্য জরুরী সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। এতে জটিলতায় আক্রান্ত মা অতি দ্রুত যথাযথ সেবা পেতে পারে যা তার নিজের ও শিশুর জীবন বাঁচাতে সহায়ক। অন্যদিকে গ্রামের তথাকথিত চিকিৎসক হাঁতুড়ে ডাক্তার বা অদক্ষ দাইদের সেবায় জটিলতার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা কমে আসবে। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত গ্রামের মায়েরা এধরনের হাতুড়ে ডাক্তারদের উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। যদিও এসব জটিলতা সম্পর্কে গ্রামীণ দাইদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, বেশিরভাগ গর্ভখালাস এখনো পর্যন্ত আত্মীয় বা অদক্ষ দাইদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে, কেননা এলাকার লোকজন এখনো পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের দক্ষতা বা ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন নন। ইউনিসেফ এবং BIRPERHT–প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত ৯০ ভাগ মা বাড়িতে অদক্ষ দাইদের সহায়তায় সন্তান প্রসব করে থাকেন। তাই পরিবার পরিকল্পনার মাঠকর্মীগণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের সম্পর্কে এবং গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসবোত্তর জটিলতার লক্ষণ সম্পর্কে অবহিত করবেন। তবে শুধু মাকেই নয়, বাড়ির মুরব্বী বা অভিভাবকগণ তথা এলাকার সবাইকে এ–বিষয়ে সচেতন করবেন। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারের প্রধান যেমন স্বামী বা শাশুড়ীদের হাতে থাকে। তাই এ–ব্যাপারে পরিবারের প্রধান তথা এলাকাবাসীকে সচেতন করে তুলতে হবে যাতে সঠিক সময়ে মায়েরা সেবাকেন্দ্রে পৌছাতে পারেন এবং সময়মত চিকিৎসা গ্রহণ ক'রে নিজের ও শিশুর জীবন বাঁচাতে পারেন। সেই সাথে সেবা কেন্দ্রসমূহের সেবার মান উন্নত করতে হবে যাতে জটিলতায় আক্রান্ত মহিলাগণ অতি দ্রুত এবং উন্নত সেবা পেতে পারেন। অন্যথায় এই উদ্যোগ সফল হবার সম্ভাবনা খুবই কম। এ–ব্যাপারে পরিবার তথা সমাজের সবাইকে দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে অহেতুক বিলম্বের জন্য কোনো মা তার সন্তান না হারান বা মায়ের মৃত্যুর কারণে শিশুটি যেন মায়ের আদর–স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়।

গর্ভকালীন সময় যদি পানি ভাঙে

বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে আইসিডিডিআর,বি–এর "মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্প্রসারণ প্রকল্প (গ্রামীণ) যৌথভাবে কাজ করছে এবং এর প্রকল্প এলাকা যশোরের অভয়নগর থানার তিনটি ইউনিয়নে এধরনের একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এলাকাবাসীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নকল্পে গর্ভ–সংক্রান্ত জটিলতা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচীর অধীনে সকল গর্ভবতী মাকে এধরনের জটিলতার বর্ণনা–সম্বলিত কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এসব কার্ডে গর্ভ ও প্রসবকালীন এবং প্রসবোত্তর বিশেষ বিশেষ জটিলতার সচিত্র লক্ষণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। কার্ড প্রদানের সময় পরিবার পরিকল্পনা কর্মীগণ উক্ত লক্ষণসমূহ মা এবং বাড়ির মুরব্বীদের নিকট ব্যাখ্যা করছেন এবং সাথে–সাথে গর্ভকালীন যত্ন, ধনুষ্টংকারের টিকা নেয়া এবং মায়ের নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। তাছাড়া সেবাকেন্দ্র সম্পর্কেও অবহিত করছেন। এতে আশা করা যাচ্ছে যে এলাকার মা–বোন ও অন্যান্য সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং অবিলম্বে জটিল অবস্থার চিকিৎসা ক'রে মা ও শিশুর জীবন বাঁচাতে সবাই উদ্যোগী হবেন। তাছাড়া এতে গর্ভকালীন যত্ন, ধনুষ্টংকারের টিকা গ্রহণের হারও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। ইতোমধ্যেই এ–ব্যাপারে গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উন্নয়ন কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া

আ: হামিদ
ডা: এম আমিনুল ইসলাম

Motivation বলতে আমরা উদ্বুদ্ধকরণ, প্রেরণা বা প্রণোদনাকে বুঝি। সাধারণত: স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বা সাধারণ মানুষের উন্নয়নে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কাছে মোটিভেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক কাজের জন্য প্রেরণা দান বা উদ্বুদ্ধকরণ একটু ভিন্ন। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার তাগিদেই আধুনিক ব্যবস্থাপনায় মোটিভেশনের প্রচলন। কর্তা ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য মোটিভেশন করে থাকেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মোটিভেশন একটি উত্তম হাতিয়ার। আর সেকারণেই মোটিভেশন সম্পর্কে উন্নয়ন কর্মীগণের ভাল ধারণা থাকা প্রয়োজন।

এই নিবন্ধে মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোটিভেশন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মোটিভেশন এমন একটা প্রক্রিয়া বা পন্থা যার মাধ্যমে মানুষের ইচ্ছাশক্তি, প্রচেষ্টা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কোনো কর্মকান্ডের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আর্থিক দিকটাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। একজন ব্যক্তির প্রচেষ্টা তার দক্ষতা, জ্ঞান ও প্রেরণার ওপর নির্ভর করে। মানুষের মনকে সুকৌশলে প্রভাবিত বা বশীভূত ক'রে কার্য–সম্পাদনে তাদের নিজ নিজ বা পারস্পরিক প্রচেষ্টা নিশ্চিত করাই হচ্ছে মোটিভেশনের প্রধান উদ্দেশ্য। মোটিভেশনের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক ও নির্ধারিত উপায়ে

(৬ এর পাতায় ২য় কলামে দেখুন)

কেঁচোকৃমি

ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র দেশ। নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধি ও অপুষ্টির মতই কৃমিজনিত সমস্যা দেশের স্বাস্থ্যসমস্যার মধ্যে অন্যতম। মূলতঃ কৃমিজনিত স্বাস্থ্যসমস্যার কারণেই রক্তশূন্যতা, পেটের পীড়া ও অপুষ্টির শিকার হচ্ছে শিশুরা। বাংলাদেশের একটি অতি সাধারণ রোগ হচ্ছে কৃমি সংক্রমণ। কেঁচোকৃমি, সুতাকৃমি, ফিতাকৃমি, বক্রকৃমিসহ বিভিন্ন ধরনের কৃমি রয়েছে। এখানে শুধুমাত্র কেঁচোকৃমি বা Ascaris Lumbricoides (Round Worm) সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

কেঁচোকৃমি কি?

এটা হচ্ছে বড় আকারের ফেকাসে-হলুদ বর্ণের একধরনের কৃমি। এটা লম্বায় প্রায় ২০ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কেঁচোকৃমির ডিম দ্বারা সংক্রমিত খাবার খাওয়ার ফলে এই কৃমির সংক্রমণ ঘটে। অর্থাৎ বলা যায়, কৃমি সংক্রমণের একমাত্র পথ হচ্ছে মুখ। মুখ দিয়েই এই কৃমি সংক্রমিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, পাকস্থলীর ডিওডেনামে অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশে কৃমির ডিম থেকে লারভা বেরিয়ে আসে এবং হামাগুড়ি দিয়ে পাকস্থলী থেকে গলনালী এবং পরবর্তী পর্যায়ে কণ্ঠনালী হয়ে ফুসফুসে চলে যায়। ফুসফুসেই এদের কিছুটা বৃদ্ধি ঘটে। অতঃপর এলভিওলাই, ব্রংকাই এবং ট্র্যাকিয়া (শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ) হয়ে পুনরায় ক্ষুদ্রান্ত্র পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর ক্ষুদ্রান্ত্রেই কেঁচোকৃমি পরিপূর্ণতা লাভ করে।

কৃমির উপসর্গ

কেঁচোকৃমি হলে বমি-বমি ভাব হয়, পেটে ব্যথা করে (Colicky abdominal pain), শরীর চুলকায়, পায়খানা অনিয়মিত হয়। অনেক সময় মুখ ও পায়ুপথ দিয়ে কৃমি বেরিয়ে আসে। শিশুদের বেলায় এই কৃমি অনেক সময় পেঁচিয়ে অন্ত্রনালীর জট বা অবস্ট্রাকশন সৃষ্টি করে। এমনকি অনেক সময় কৃমি এপেন্ডিক্সের মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে এপেন্ডিসাইটিস (এপেন্ডিক্সের প্রদাহ)-এর মত মনে হয়। কৃমি শরীরের খাদ্যোপাদান খেয়ে ফেলে। ফলে অপুষ্টি দেখা দেয়।

রোগ নিরূপণ

প্রথমতঃ শিশুদের পেট ও বাহ্যিক উপসর্গ দেখে কৃমি সংক্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়। এক্ষেত্রে শিশুর পেট মোটা হয়ে যায়, রক্তশূন্যতা থাকে। শিশু অপুষ্টিতে ভুগতে পারে। শরীরে চুলকানি থাকতে পারে। এছাড়া সবচাইতে ভাল দিক হচ্ছে মল পরীক্ষা করে কৃমির সংক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। মলে কেঁচোকৃমির ডিম (Ova) পাওয়া গেলে সংক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

কেঁচোকৃমির চিকিৎসা

বাংলাদেশে কৃমিরোগের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ধরনের ঔষধ পাওয়া যায়। তবে মেবেন্ডাজল ও লিভামিজল ঔষধের ব্যবহার হয় বেশি। এসব ঔষধ বাজারে বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামে পাওয়া যায়। লিভামিজল ট্যাবলেট বা সিরাপ-এর একটি ডোজ সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে মেবেন্ডাজলের ক্ষেত্রে ট্যাবলেট ও সিরাপ পরপর ৩ দিন সকালে ও রাতে সেবন করতে হয়। ঔষধের লেবেলের উপর সেবন-বিধি লিপিবদ্ধ থাকে। মেবেন্ডাজল ট্যাবলেট ১টা করে দিনে ২ বার তিন দিন অথবা একই নিয়মে সিরাপ সেবন করা যেতে পারে। লিভামিজল বড়দের ক্ষেত্রে একত্রে তিনটি বড়ি; শিশুদের জন্য ৫ বছরের নিচে ১ বড়ি; ৫ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত ২ বড়ি সেবনযোগ্য অথবা কৃমিনাশক সিরাপের বোতলের নির্দেশিকা অনুযায়ী শিশুদের সিরাপ সেবন করানো যায়। উল্লেখ্য, বাজারে এ্যালবেন্ডাজল নামের আরো একটি ঔষধ পাওয়া যায়। এই ঔষধের একটি ডোজই কার্যকর। এ্যালবেন্ডাজল ট্যাবলেটের একটি ডোজ প্রাপ্তবয়স্কদের বেলায় ২টি বড়ি এবং ১২ বছরের কম হলে ১টি বড়ি রাতে খেতে হবে।

রোগ প্রতিরোধের উপায়

* স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালীর ব্যবহার করা, উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ না করা।
* জীবাণুযুক্ত খাবার, বিশেষ করে খোলা খাবার না খাওয়া, মাটিতে উৎপন্ন শাক-সব্জি, ফল যেমন পেয়ারা, তরি-তরকারি ইত্যাদি ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে খাওয়া এবং পানি ফুটিয়ে খাওয়া।
* হাতের নখ ছোট করে কেটে রাখা যাতে কোনো ময়লা আটকে না থাকে।
* দাঁত দিয়ে হাতের নখ কাটার মত খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।
* প্রতিবার মলত্যাগের পর সাবান অথবা ছাই দিয়ে হাত পরিস্কার করে প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
* শিশুদের স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মলত্যাগ ও পরিস্কার করার ব্যবস্থা করতে হবে।

উদ্বুদ্ধকরণ

(৫ এর পাতার পর)

কোনো কাজ করতে কিংবা ভ্রান্ত ও অনির্ধারিত উপায়ে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। জনসাধারণকে তাদের কর্ম, আচরণ ও সম্পদের সর্বাধিক সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে এই পন্থা সহায়তা করে থাকে। এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন, মানুষকে কেবলমাত্র মুখের কথায় নয় বরং বাস্তবে সফল কাজের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সাধারণত: প্রত্যক্ষভাবে কোনো আর্থিক সুযোগ-সুবিধা অথবা সম্মানজনক পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হয় না। অবশ্য পরোক্ষভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মানের কিছুটা উন্নতি হয়। এখানে উল্লেখ্য যে শুধু তথ্য পরিবেশন করা মানে মোটিভেশন নয়—তাদের উক্ত কাজে উৎসাহিত ও সক্রিয় করে তোলাই মোটিভেশনের উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কোনো মায়ের শুধু খাবার স্যালাইন তৈরির জ্ঞান থাকলেই চলবে না, প্রয়োজনে তার তা ব্যবহার করার স্বত:স্ফূর্ত আগ্রহ থাকতে হবে। এই আগ্রহ সৃষ্টির পেছনে যে শক্তি কাজ করে থাকে সেটাই হচ্ছে মোটিভেশন।

মোটিভেশনের একটি কার্যকর মাধ্যম ব্যক্তিগত যোগাযোগ

মোটিভেশনের কয়েকটি তাত্ত্বিক দিক ও প্রয়োগের উপায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

১. **ব্যক্তির স্বভাব ও আচরণ বিশ্লেষণ :** মানুষের স্বভাব ও আচরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও জটিল। অনেক মনোবিজ্ঞানী আজীবন তপস্যা করেও "মনুষ্যাচরণের সাধারণ ফর্মূলা" নির্ণয় করতে পারেন নি। একজন মানুষের চাহিদার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তার এই আচরণের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। আবার ব্যক্তি-চাহিদা পুরণের মাধ্যমেও মোটিভেশন সম্ভব নয়, কারণ মানুষ অভাবী প্রাণী। অধ্যাপক ম্যাক গ্রেগরের মতে, "চরিতার্থ চাহিদা মনুষ্যাচারণকে প্রণোদিত (motivate) করে না। তাই চাহিদা পুরণের মাধ্যমে মোটিভেশন স্থায়ী হতে পারে না। সুতরাং মোটিভেশনের সময় ব্যক্তির স্বভাব ও আচরণ বিশ্লেষণ করা দরকার।

২. **সুফল প্রাপ্তির ধারণা :** সমাজ-বিজ্ঞানী ডেভিড ম্যাক ফ্লিল্যান্ড তাঁর "The Achieving society" গ্রন্থে বলেছেন, মানুষকে যদি কোনো কাজে যথাযথ জ্ঞান দান করা যায় এবং ঐ কাজের সুফল সম্পর্কে আগেই ধারণা দেয়া যায় তবে সে উক্ত কার্য-সম্পাদনে অধিকতর অনুপ্রাণিত হয়। সুতরাং কোনো বিষয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার সময় সেই বিষয় থেকে প্রাপ্য সুফলের ব্যাপারে ধারণা দেয়া দরকার।

৩. **লাভজনক ফলাফলের নিশ্চয়তা :** অধ্যাপক নিউম্যানের মতে, 'কোনো মানুষ তখনই কোনো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয় যখন সেই কাজ থেকে প্রাপ্ত সুফল তার ব্যয়, ত্যাগ ও পরিশ্রম থেকে বেশি হয়। ব্যক্তিগত কোনো কাজের লাভালাভের ব্যাপারে যখনই মানুষের স্পষ্ট ধারণা থাকে তখনই মানুষ সে-কাজটি করার জন্য উৎসাহিত হয়, কারণ আত্মস্বার্থ এবং সন্তুষ্টিলাভ মানুষের অন্যতম স্বভাব।

৪. **ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাস এবং আস্থা অর্জনের মাধ্যমে মোটিভেশন :** একজন উন্নয়নকর্মীকে আকৃষ্ট করার মত ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বদানের গুণাবলী-সম্পন্ন হতে হবে। রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ তাঁদের দলীয় কর্মীদেরকে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে প্রণোদিত বা উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। এ-কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মী শুধু শ্রমই নয়, এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে। আর এই ত্যাগের জন্য শুধু দলের মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই কাজ করে না, নেতার গুণাবলী, বিশেষ করে তার ব্যক্তিত্ব, বাচনভংগী এবং নেতার উপর কর্মী বা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনেকাংশে তাদের উদ্বুদ্ধ করে থাকে। সুতরাং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য উন্নয়নকর্মীর (সমাজকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, মাঠকর্মী ইত্যাদি) এসব গুণাবলী থাকা অপরিহার্য।

৫. **তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মোটিভেশন :** একজন লোকের পক্ষে সবার মন জয় করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি কোনো উন্নয়নকর্মী সমাজের সকলের নেতৃত্বদানে অথবা আস্থা অর্জনে সক্ষম নাও হতে পারেন। এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে, যেমন গ্রাম এলাকায় দেখা যায় স্বাস্থ্যকর্মী দলীয় স্বাস্থ্যশিক্ষা দেয়ার সময়ও টিকা দান করার জন্য মেম্বার ও গ্রাম্য মাতব্বরের বাড়ি/আংগিনা ব্যবহার করে থাকেন। প্রয়োজনে উদ্বুদ্ধকরণের জন্যও তাঁদের সাহায্য নিয়ে থাকেন। বস্তি এলাকার নেতাদের মাধ্যমেও এই একই কাজ করা সম্ভব।

এছাড়া মিটিং, মিছিল, পোস্টার, যাত্রা, থিয়েটার, প্রচারপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

জনসাধারণ সব সময় সমানভাবে উদ্বুদ্ধ থাকে না। অনেকক্ষেত্রেই তা ক্ষণস্থায়ী হয় অথবা ক্রমশ: হ্রাস পেতে পেতে এক সময় তা ফুরিয়েও যায়। মানুষের মনে বিশ্বাস, এমনকি ধর্মীয় বিশ্বাসের মত বিষয়েরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। জীবন বৈচিত্র্যময় বলে বিভিন্ন পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা মোটিভেশনকে স্তিমিত করে দিতে পারে। ফলে দেখা যায় শিশুর পরিপূরক খাবার ও ঘরে খাবার স্যালাইন ব্যবহারের ব্যাপারে মায়েরা মোটিভেটেড থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের সময় তারা তা করতে অনেকক্ষেত্রে ব্যর্থ হন। কাংখিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রমের ফলাফল একারণেই বিলম্বিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোগত দিক ছাড়াও জনসাধারণের সৃষ্ট সমস্যাও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। তাই শত প্রতিকূলতার মাঝেও যাতে মোটিভেশন কার্যক্রম হ্রাস না পায় সেজন্য সবসময় এলাকাবাসীদের নিজস্ব উদ্যোগ ও উন্নয়নকর্মীদের তদারকী দরকার। আর এজন্যই এলাকাবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের মোটিভেশন কার্যকর হতে পারে।

স্বাস্থ্য কুইজ-১১

১। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর মাধ্যমে শিশুদের কি কি রোগ প্রতিরোধ করা যায়? এ কর্মসূচীর অধীনে কোন বয়সে কোন টিকা দিতে হয়?

২। গুটি বসন্ত রোগ পৃথিবী থেকে নির্মুল করা হয়েছে। সর্বশেষ আক্রান্ত রোগী কখন কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?

৩। জলাতংক রোগ কেন হয়? এ-রোগের লক্ষণ কি কি? এ-রোগের এরকম নামকরণের কারণ কি?

৪। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আই.ইউ.ডি. ব্যবহারে কি কি পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হতে পারে?

৫। ভিটামিন 'সি' যুক্ত পাঁচটি খাবারের নাম লিখুন।

(উত্তর আমাদের কাছে ২০ মার্চ ১৯৯৫ তারিখের আগেই পৌছাতে হবে)

স্বাস্থ্য কুইজ-১০ এর উত্তর

১। গর্ভখালাসের সম্ভাব্য তারিখের ২ সপ্তাহের পরও যদি সন্তান না হয় তখন অবশ্যই ডাক্তারের কাছে প্রেরণ করতে হবে। ডাক্তার তখন গর্ভখালাসের ব্যবস্থা করবেন।

২। একজন নবজাতকের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮°—৯৯° ফারেনহাইট, স্বাভাবিক হৃদস্পন্দন মিনিটে ১১০—১৪০ বার, এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি মিনিটে ৬০ বারের কম।

৩। যদি কোনো গর্ভবর্তীকে ঝুকিপূর্ণ (High Risk Pregnancy) বলা হয় তার মানে এই যে মহিলার জটিলতা দেখা দিতে পারে। ঝুকিপূর্ণ গর্ভবতী সনাক্ত করার মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ঝুকিপূর্ণ গর্ভের ৫টি লক্ষণ হলো : (১) পূর্ববর্তী গর্ভ বা প্রসবের সময় জটিলতা বা অপারেশন, (২) যমজ বা ততোধিক গর্ভস্থ শিশু, (৩) রক্তস্রাব, (৪) উচ্চ রক্তচাপ এবং (৫) মারাত্মক রক্তহীনতা ইত্যাদি।

৪। দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া মানে যে ডায়রিয়া কমপক্ষে ১৪ দিন স্থায়ী থাকে। এ-রোগে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে। যার ফলে অন্যান্য রোগ সহজে দেহে আক্রমণ করে।

৫। নরপ্লান্টে থাকে কেবলমাত্র একটি হরমোন যার নাম 'প্রজেস্টেরন'। নরপ্লান্টের কার্যকারিতা ৫ বৎসর।

আমরা কারো কাছ থেকে সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাই নি

জেনে রাখা ভালো

উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জ্ঞাতব্য

ডাঃ মতিউর রহমান

করণীয়

১। শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপন করবেন
২। নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করাবেন (কমপক্ষে মাসে ১ বার)
৩। নিয়মিত ঔষধ খাবেন
৪। সপ্তাহে ১ দিন পূর্ণ বিশ্রাম নেবেন
৫। প্রত্যহ কিছুক্ষণ হাঁটার অভ্যাস করবেন
৬। দুপুরের খাবারের পর সম্ভব হলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন
৭। প্রত্যহ ৬ ঘন্টা ঘুমাবেন
৮। শরীরের বাড়তি ওজন কমাবেন
৯। নতুন কোনো উপসর্গ দেখা দিলে আপনার চিকিৎসককে জানাবেন

নিষেধ

১। চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ঔষধ বন্ধ করবেন না বা ঔষধের ডোজ কমাবেন না বা বাড়াবেন না
২। দুঃশ্চিন্তা যতদুর সম্ভব এড়িয়ে চলুন
৩। শরীরের ওজন বাড়াবেন না
৪। উত্তেজিত হবেন না
৫। অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না

খাবেন

১। সয়াবিন তেলের রান্না
২। বেশি করে শাক-সব্জি, ফল, সালাদ
৩। মুরগির মাংস [চামড়া, কলিজা বাদে]
৪। মাছ
৫। ডাল, ভাত, রুটি, হালকা চা

খাবেন না

১। গরুর মাংস, খাসির মাংস
২। চিংড়ি মাছ
৩। কলিজা, মগজ
৪। নারিকেল
৫। ঘি, মাখন, চর্বি, বাটার ওয়েল, ডিম [বিশেষ করে কুসুম], পূর্ণ ননীযুক্ত দুধ, সর, দুধের তৈরী খাবার
৬। আলগা লবণ, বেশি লবণযুক্ত খাবার
৭। বিড়ি-সিগারেট, তামাক পাতা, জর্দা, গুল
৮। মাদক দ্রব্য

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; **সম্পাদক ঃ** ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ** এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর ঃ** ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম; **সদস্য ঃ** ইউসুফ হাসান, মুজিবুর রহমান ও ডাঃ তানজিনা মির্জা; **সার্কুলেশন ম্যানেজার ঃ** হাসান শরীফ আহমেদ; **ডিজাইন ঃ** আসেম আনসারী; **প্রকাশক ঃ** আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আই.সি.ডি.ডি.আর.,বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০

ফোন ঃ ৬০০১৭১-৮; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬; টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আই.সি.ডি.ডি. বি.জে

মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ